Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No. 01-08
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত : একটি সাহিত্যিক বিশ্লেষণ

ড. প্রদীপ বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শম্ভুনাথ কলেজ, লাভপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Shakta Padavali was the offshoot of the Bengali Bhakti Movement. Ramprasad Sen (1718-1775) was considered to be the first poet – devout of this poetic tradition. Immediately after Ramprasad the poet who expanded the tradition was none other than Kamalakanta Bhattacharyya (1769-1821), another poet-devout. Jointly they composed more than thousands songs. The style, from diction and thematic variety of the Shakta Songs (Shakta Padas) took shape and maturity in their hands. In terms of age and talent Ramprasad was undoubtedly superior to his successor, Kamalakanta. Accepting this superiority, Kamalakanta unquestionably considered himself to be the disciple of Ramprasad. Kamalakanta decorated the Shakta Song with artistic workmanship which was originally built by Ramprasad. Agamani, Vijaya, Bhakter Akuti etc. were the creations of Ramprasad in this Padavali tradition and Kamalakanta expanded it. In their creations despite having some similarities, striking dissimilarities did not go un-noticed. Here Ramprasad was self-absorbed and often lost in self-possession while creating a Pada (song), Kamalakanta was, at best, self-consciously an artist by his own right. Ramprasad was simple, somewhat straight and unostentatious in his presentation; on the other hand Kamalakanta was erudite and poet-laureate like or rather, like a Court-Poet. The dissimilarities as found Chandidas and Vidyapati in the Vaisnav poetic tradition are to be found in these to poet-devotees. The purpose of this article is to make a comparative analysis of these two great poets of the Shakta tradition.

Keywords: Shakta Padavali, Ramprasad, Kamalakanta, Court-Poet.

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মজা করে বলতেন ‘গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে মিলে এক’। রামপ্রসাদের (১৭১৮খ্রি -১৭৭৫খ্রি)[১] সৌভাগ্য যে, তিনি যোগ্য চেলা পেয়েছিলেন, কমলাকান্তকে (১৭৬৯খ্রি -১৮২১খ্রি)[২]। কমলাকান্ত রামপ্রসাদকেই তাঁর শাক্তগানের কাব্যগুরু রূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। গুরু সত্যদর্শী, আলোক দ্রষ্টা। শিষ্যকে অজ্ঞান থেকে আলোকের বৃত্তে পৌঁছে দেন হাত ধরে। ‘কুলার্ণবতন্ত্রে’ গুরু শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

“গুশবদস্তন্ধকারঃ স্যাৎ রুশবদস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে”।[৩]

অর্থাৎ, 'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার, আর 'রু' শব্দের অর্থ তার 'নিরোধক'। অন্ধকার নিরোধ করেন বলেই গুরুকে 'গুরু' বলা হয়। এছাড়াও গুরু শব্দে সিদ্ধিদাতা পাপদগ্ধকারী, গুহ্যজ্ঞানদাতা ইত্যাদিও বোধায়। রামপ্রসাদ বাস্তবিক, সবদিক দিয়েই শাক্তসমাজের এবং শাক্তসাহিত্যের গুরু সদৃশ প্রণম্য ব্যক্তি। শাক্তসাধনার তত্ত্ব-দর্শনকে তিনিই প্রথম সাহিত্যের ক্ষেত্রে পল্লবিত করার দুর্লভ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তিনিই মঙ্গলকাব্য রূপ আখ্যান ধারার জটাজাল থেকে 'শাক্তপদতরঙ্গিণীকে' মর্ত্যভূমিতে নামিয়ে এনেছিলেন। বাংলার ধর্ম, দর্শন, সাহিত্যে একটা নব অধ্যায়ের পাতা খুলে দিয়েছিলেন। তিনিই বাংলা শাক্তগান ধর্মগঙ্গার ভগীরথ। সমালোচক যথার্থই বলেছেন:

"ভারতীয় ঋষিগণ যে অর্থে 'কবি' নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন সেই অর্থেই তিনি কবি। কবি সিদ্ধপুরুষ। সত্যদ্রষ্টা - তিনি ঋষি। তাই তাহার ধ্যানে যে আর্বিভাব হয়, তাহা অপৌরুষেয়। তাহা যেন মানুষের রচনা নয়, অলৌকিক। সে মন্ত্রের শক্তি ও বিভূতি অসাধারণ। এই জন্য ঋষিরা বলিলেন, 'কবিমণীষী'- কবি জ্ঞানী। যাঁহারা সিদ্ধ তাহারাই জ্ঞানী, তাঁহারাই কবি। এই অর্থেই রামপ্রসাদ কবি। পূর্ববর্তী সাধকগণ সাধনার সিদ্ধি ও ফলকে হয় গোপন রাখিয়াছেন, নয় সংস্কৃত ভাষার বন্ধনে সেই শাম্ভবী আনন্দকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। রামপ্রসাদ এখানে সিদ্ধির আনন্দ ও সিদ্ধিলাভের সঙ্কেতকে গৌড়ীয় ভাষায় জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া, গৌড়জনের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই অকৃপণ দানে বাংলাদেশ ধন্য হইয়াছে।

শক্তি-বিষয়ক কবিতা ও কাব্য পূর্বে রচিত হইলেও, রামপ্রসাদের গানের মতো তাহা এমন করিয়া মানুষকে মাতাইতে পারে নাই। একদিন মহাপ্রভুর অশ্রু, কম্প, পুলক স্বেদাদিযুক্ত উদ্দন্ড কীর্তন যেমন করিয়া বঙ্গবাসীকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, রামপ্রসাদের 'মালসি'ও তেমনি এ দেশের শিরায় শিরায় উন্মাদনা সঞ্চার করিয়াছে। এই দিক হইতে রামপ্রসাদ হইতেই শ্যামাসঙ্গীতের সম্যক স্ফূর্তি। রামপ্রসাদ শাক্তপদতরঙ্গিণীর গোমুখী।"[৪]

সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতই তিনি জগৎ ও জীবনের অন্তরালের রসহ্যময় সত্যটি আবিষ্কার করেছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন যে এক সর্বাত্মিক মহাশক্তি বিভিন্নরূপে, বিভিন্নস্থানে, বিভিন্ন নামে বিরাজিত। জগতের কার্য এবং কারণ দুই-ই সেই আদ্যাশক্তি। এই আদ্যাশক্তিকেই বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। কেউ ডাকেন 'গড' বলে, কেউ বলেন 'খোদা', কেউ বলেন 'ফরাতরা'। রামপ্রসাদ বুঝেছেন সেই সব নামের অন্তরালে আসলে একজনই বিরাজিত। তিনি এক মহাশক্তি। সেই আদ্যাশক্তিকেই তিনি 'কালী', 'তারা' ইত্যাদি নামে ডেকেছেন:

"জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজী
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজী"।

এমনই সর্বধর্ম, সর্বদর্শনের সারাৎসার তাঁর মাতৃজ্ঞান। এই জগৎ-সৎসারকে দেখেছিলেন সেই মহামায়ারই লীলাচাঞ্চল্যের প্রকাশ হিসেবে। মায়াভরা সংসারকে 'ধোঁকার টাটি' জ্ঞান করেছিলেন। আবার সেই মহাশক্তি মহামায়াকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন আপনার দেহমন্দিরে। গানে বলেছেন:

"একবার ডাকরে কালী তারা বলে, জোর করে রসনে
ও তোর ভয় কিরে শমনে।
কাজ কি তীর্থ গঙ্গা, কাশী যার হৃদে জাগে এলোকেশী"।।

জগজ্জননীকে ডাকার মত ডাকাতে পারলে তিনি শুধু সন্তানের দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন তাইই নয়, সন্তানের ঘরের বেড়াও বেঁধে দিয়ে যান পরম মমত্বে। সেই মহান সত্য রামপ্রসাদই প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন তাঁর জীবনে ও তাঁর গানে। সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় লেখা তাঁর শাক্তগানই বাঙালিকে মায়ের নামে গান বাঁধতে শিখিয়েছিল। গানকে কী ভাবে আত্মনিবেদনের উপযোগী করে তুলতে হয় তা তাঁরই শেখানো।

কমলাকান্তের আর্বিভাব রামপ্রসাদের মৃত্যুর কয়েক বছর আগে। কমলাকান্ত যে সময় কাব্য সাধনা করেছেন বা ধর্ম সাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন তখন বাংলাদেশে রামপ্রসাদের গানের প্রচার এবং প্রসার ব্যাপক ভাবে ছিল। কমলাকান্ত সজ্ঞানেই অগ্রজকে অনুসরণ করেছিলেন। রামপ্রসাদের গানের সূত্রটিকে কণ্ঠে ধারণ করে নিয়েছিলেন। কমলাকান্তের মধ্যে যে গীতিকার, যে সুরকার এবং যে গায়ক প্রতিভা ছিল, যা প্রথম জীবনে লেখা বৈষ্ণবপদাবলি, 'সাধকরঞ্জনের' মতো গ্রন্থগুলিতে আপনার পথ খুঁজে ফিরছিল, রামপ্রসাদের গানে সেই রুদ্ধ নির্ঝরের যেন স্বপ্নভঙ্গ হল। আপনার গানের প্রাণের পথ খুঁজে পেলেন তিনি। তার পর থেকে লিখে গেছেন একের পর এক গান। গানে গানে মুখরিত করে দিয়েছিলেন রাঢ়বঙ্গের রাঙামাটি। রাঢ়ের রাঙামাটির রঙেই আছে আত্ম উৎসর্গের মহান ব্যঞ্জনা। কমলাকান্তের জীবন উৎসর্গ হল শ্যামামায়ের পূজার জন্য গীতি-পুষ্প রচনে। শাক্তগানের যে পূত-পবিত্র সুরমুর্চ্ছনা রামপ্রসাদের কণ্ঠে উৎসারিত হয়েছিল, কমলাকান্ত সেই সুরেই সুর বাঁধলেন। রামপ্রসাদ গেয়েছেন:

"অপার সংসার নাহি পারাপার
ভরসা শ্রীপদ সঙ্গের সম্পদ বিপদে তারিণী করগো নিস্তার।
যে দেখি তরঙ্গ অবাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ডুবে বা মরি।
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরি রাখ এইবার"।

কমলাকান্ত গাইলেন:

"মা মোরে লয়ে চল ভবনদী পার গো তারা
আমি অতি অকৃতি অধম দুরাচার।
সম্বল আছিল যার অনায়াসে হৈল পার
কিছু ধন নাহিক আমার যে নাবিকে দিব মা
প্রদোষ সময়ে ধরম তরী বায় নেয়ে
চেয়ে আছি চরণ তোমার গো তারিণি"।

সকল ধর্মাধর্ম, বিভেদ-বিদ্বেষের উর্ধে শ্যামামায়ের মধুর লীলা। শ্যামামায়ের যুগল পদ সর্ব-ধর্ম-মিলন তীর্থ। রামপ্রসাদের গান সেই মিলনের গান:

"মন কর না দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদাগমপুরাণে করিলাম কত খোঁজ তল্লাসি।
ঐ যে কালীকৃষ্ণ শিবরাম, সকল আমার এলোকেশী"।

কমলাকান্তের গানেও সেই মহামিলনের মহানধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে :

"জাননারে মন পরম কারণ কালী কেবল মেয়ে নয়
সে যে মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়।
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি দনুজ তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশি ব্রজঙ্গনার মন হারিয়ে লয়।"

এই দুই কবির কণ্ঠ ভাবে, ভক্তিতে, নিবেদনের ঐকান্তিকতায় এবং ধর্মীয় দ্বেষা-দ্বেষীর উর্ধে এক সূত্রে গাঁথা পড়ে গেছে। দুইজনেই মাতৃনামের 'মহাসংগীতে' মত্ত হয়েছেন। সমালোচকের আলোচনায় তারই স্বীকৃতি শোনা যায় :

"অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলি তথা মাতৃসঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ দুটি স্থান অধিকার করে রয়েছেন সাধক রামপ্রসাদ ও সাধক কমলাকান্ত।... তাঁদের সমুন্নত সাধক জীবনের ছায়াপাত ঘটেছিল তাঁদের মাতৃসঙ্গীতে, যার ফলে এক মহৎ উদার অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন আদর্শ সেখানে সুষ্ঠ ভাবে ফুটে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নৈতিক অধঃপতনের দিনে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের মাতৃসঙ্গীত ভাব, ভাষা, ভক্তি ও সাধনার অপূর্ব মেলবন্ধনের মাধ্যমে মানুষের কাছে নিয়ে এসেছিল এক শুভ আদর্শের ধ্রুবচেতনা। তাদের মাতৃসঙ্গীত মানুষকে দিয়েছিল নতুন জীবনের স্পর্শ এবং ঘটিয়েছিল ক্ষয়িষ্ণু ও অবনত সাধনায় এক নবচেতনার উন্মেষ, যা নির্মাণ করে দিয়েছিল শক্তি সাধনার সহস্রধারা সঙ্গম মুখ।"[৫]

।দুই।

তবে উভয়ের মধ্যে এই ভাব-তত্ত্বগত সাদৃশ্য যেমন আছে বৈশাদৃশ্যও কম নয়। এই সাদৃশ্য- বৈশাদৃশ্য উভয় কবির মহাপ্রতিভারই স্বাক্ষরবাহী। যোগ্য শিষ্য ছাড়া যেমন গুরুমন্ত্র নিষ্ফল, তেমনই সামর্থবান শিষ্যই পারে গুরুর মহিমা অক্ষুন্ন রাখতে। প্রতিভার গুণেই কমলাকান্ত তাঁর কাব্য বৈশিষ্ট্যের-একটা নতুন ধারা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভাবতন্ময় চিত্তে রামপ্রসাদ অখিলাত্মিকা চিন্ময়ীর যে মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন, সেই মৃন্ময়ীকে ভাষা, ছন্দ, অলংকারের ঔজ্জ্বল্যের অপরূপতা দান করলেন কমলাকান্ত। ভাবের সঙ্গে বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের যোগ হল। রূপের লৌকিকতায় বৈদগ্ধ্যের দীপ্তি ঝিকমিকিয়ে উঠল। প্রসাদীসুরের তাল রাগে সংযোজিত হল বৈচিত্র্যের রামধনু। প্রসাদের আত্মাভোলা 'ভাবেরগান' হয়ে উঠল বুদ্ধিজীবীর মার্গসংগীত। শ্রদ্ধেয় সমালোচক রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্তের কবিস্বভাবের এই স্বাতন্ত্র্যটি মাত্র কয়েকটি কথায় চমৎকার তুলে ধরেছেন :

"বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় চন্ডীদাস ও গোবিন্দদাস কবিরাজের যে পার্থক্য শাক্তপদাবলী রচনায় রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের মধ্যেও সেই পার্থক্য। একজন ভাবতন্ময়, অন্যজন সচেতন শিল্পী, একজন সরল, অনাড়ম্বর- তাহাতে ছন্দোনৈপুণ্য নাই, বাকচাতুরী নাই- আছে আত্মহারা ভক্তের আত্মহারা ভাব; অপরজন আত্মমগ্ন হইলেও আত্মহারা নহেন, তাঁহার বিচার আছে, সংযম আছে- তাই ছন্দের মাধুরী ও শ্রুতিমধুর শব্দ ঝঙ্কারের প্রতি তাঁহার সজাগ দৃষ্টি, 'রসনা-রোচন, শ্রবণ- বিলাস, রুচির পদ'- এর প্রতি আকর্ষণ"।[৬]

বস্তুত, শাক্তগীতিধারায় রামপ্রসাদের পর কমলাকান্তের নাম সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয় তা তাঁর এই কাব্য বৈশিষ্ট্যের স্বকীয়তার গুণেই। 'প্রসাদী সংগীত', সংগীতই। সুর-তাল-লয়ে সংযোজিত হলে তবে তার আবেদন পরিস্ফূট হয়। কমলাকান্তের গান সংগীত ছাড়াও কবিতা। পাঠ করেও গানগুলির রসাস্বাদন করা চলে। আলোচক লিখেছেনঃ

"রাম প্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত সুরে সমর্পিত হইবার অপেক্ষা রাখে, গানে না শুনিলে তাহার অর্ধেক মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু কমলাকান্তের পদাবলী গীতিকবিতার মত আস্বাদ্য, কেবল মাত্র আবৃত্তি করিয়াও তাহার মাধুর্য্য আস্বাদন করা সম্ভব।"[৭] যেমন:

"শুকনা তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা ভাঙ্গে পাছে।
তরু পবন বলে সদাই দোলে,
প্রাণ কাঁপে মা থাকতে গাছে।"

বা

"মজিল মন-ভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে"।।

ইত্যাদি গানগুলোর পাঠ সুষমা মনে ধরে রাখার মত। শ্রুতিসুখকর শব্দ সংযোজনের যে বিশেষত্ব-ধ্বনিঝংকারময়তা, শব্দের সেই শ্রুতিমধুর ধ্বনিসৌকুমার্য কমলাকান্তের গানে উদ্ভাসিত হয়েছে, যা পাঠক চিত্তকে মোহিত করে এবং একই সঙ্গে গান এবং কবিতার রসাস্বাদ এনে দেয়।

অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাগানের অনুশীলনে যাত্রাগান, পাঁচালি, টপ্পা, কথকতা ইত্যাদির পাশাপাশি ধ্রুপদী মার্গসংগীতেরও ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছিল। নিধুবাবু, কালী মির্জা প্রমুখের গানের আধারই ছিল রাগাশ্রিত ভারতীয় মার্গসংগীতের আদর্শ। বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর, দেওয়ান রঘুনাথ প্রমুখ ছিলেন কালী মির্জার সমবয়সী। বর্ধমান রাজার নির্দেশে রাজার দেওয়ান রঘুনাথ দিল্লির এক প্রসিদ্ধ সংগীত শিক্ষকের কাছে রাগসংগীতের তালিম নিয়ে এসেছিলেন। বর্ধমান রাজার পুত্র প্রতাপচন্দ্রও কমলাকান্তের অনুপ্রেরণায় গানের বিশেষ ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কমলাকান্ত বর্ধমান রাজবাড়িতে এমনই একটা সংগীতের পরিবেশ পেয়ে গিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে সমকালের রাগসংগীতের ঐতিহ্যেই কমলাকান্তের সংগীত সাধনা লালিত পালিত হয়েছিল। ভারতীয় রাগ-রাগিণীর মার্গীয় বৈশিষ্ট্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন অন্তরের শুদ্ধতায়। তাঁর 'শিল্পীমন' এবং গীতিকার প্রতিভা এই ভারতীয় মার্গসংগীতের শুদ্ধতাতে আপনার গানের ভাবের যথার্থ মুক্তির সন্ধান করে নিয়েছিলো। সমালোচকের বিচারে প্রসাদীসুর প্রচলিত একটি বাউল সুর, যার ভিত্তি ছিল 'আলাহিয়া' রাগ।[৮] আলাহিয়া প্রাচীনতম সম্পূর্ণ রাগ। যার সব পর্দা শুদ্ধ। বৈজু, তানসেন, প্রমুখ বিখ্যাত সংগীতজ্ঞগণ এই আলাহিয়া রাগে এক সময় প্রচুর গান রচনা করেছিলেন। প্রসাদ তাঁর গানের ভাবকে এই রাগেই সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁর গানের চালটি ছিল ধীর, এবং একতালায় নিবদ্ধ। কমলাকান্তের গানে রাগ- রাগিণীর এবং তালের বৈচিত্র্য অনেক বেশি। আলোচক লিখেছেন:

> *"কমলাকান্তের অনুরাগ সর্বব্যাপী, মাতৃসাধনা ও মাতৃসংগীতের মধ্যে কোনও বিভেদ মনে আনতেন না। তবে সাংগীতিক প্রয়োগ বিদ্যা (Technicalities) সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনি জানতেন কী করে স্বরচিত কবিতা মাতৃসংগীতগুলিকে উপযুক্ত রাগ, ছন্দ ও তালে সুমন্ডিত করবেন।"*[৯]

সংগীতজ্ঞদের বিচারে বিলাবল, পরজ, মুলতান, বেহাগ, ঝিঝিট, বাহার, কেদারা, ললিত, রামকেলি, হাম্বীর, কাফি, সরফরদা ইত্যাদি ভারতীয় মার্গসংগীতের বিবিধ উল্লেখযোগ্য রাগরাগিণীর সংযোজনে কমলাকান্তের গানে বিরাট বৈচিত্র্য এসেছে। তাঁর গানে কমলাকান্ত প্রায় পঞ্চাশটির মতো রাগের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর বিশেষ পছন্দের রাগ ছিল পরজ, কালেংড়া, ঝিঝিট, যোগিয়া, সিন্ধু, মুলতান, সুরট এবং খাম্বাজ।[১০]

ধর্ম দর্শনে তিনি যেমন অভেদবাদী ছিলেন রাগ-রাগিণীর ব্যবহারেও ছিলেন গোঁড়ামি শূন্য। সেই সময় বাইজিদের মধ্যে টপ্পা গানের জনিপ্রিয়তা ছিল বেশ। সেক্ষেত্রে 'কাফি' রাগটির বিশেষ ব্যবহার হত। কমলাকান্ত নিশ্চিন্তে 'কাফি' রাগটি ব্যবহার করেছেন তাঁর মাতৃসংগীতে। যেমন কাফি রাগে লেখা নিম্নোক্ত গানগুলিতে শ্যামামায়ের ভাববৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন অসাধারণ গীতিনৈপুণ্যের সঙ্গে:

"মোরে বঞ্চনা কেন কর তারিণী গো মা
ত্বমসি ভবার্ণব তারণ তরণী সুমতি কুমতি গতিদায়িনী।
ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাহি মম, মিছা কাজে গেল দিনযামিনী।"

বা

"শিখেছ যতনে যত চাতুরী।
মন হয়েছে আপনি রিপু আপনার।"

রামপ্রসাদের ধীরলয়াশ্রিত বাউলসুর প্রভাবিত 'একতালা'-র গানে কমলাকান্ত যথার্থই বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছিলেন। যা পরবর্তীকালের বাংলা গানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। আলোচক বলেছেন:

"রামপ্রসাদের মৃত্যুর পরে এক শতাব্দীর মধ্যেই দুটি সাংগীতিক ঐতিহ্য অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে, শ্যামাসংগীত ও রাগসংগীত, তার সঙ্গে প্রথমটির মধ্যে দ্বিতীয়টির অনুপ্রবেশ, যার পশ্চাতে কমলাকান্তের নিজস্ব অবদান বড় কম নয়।"[১১]

।। তিন।।

তবে মাঝে মাঝেই রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্তের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দ্বেষা-দ্বেষ মূলক মন্তব্য শোনা যায়। শোনা যায় আশ্চর্য রকম সব স্ববিরোধী মতামত। যেমন শ্রদ্ধেয় শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা' গ্রন্থটি শাক্তগান এবং শক্তিসাধনা সম্বন্ধীয় অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ আকর গ্রন্থবিশেষ। শ্রীচক্রবর্তী রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্তের মাতৃ সাধনার তুলনা টানতে গিয়ে কেন জানি না মন্তব্য করেছেন:

"শাক্তসাধনার স্তর আছে। রামপ্রসাদ সিদ্ধির যে উর্দ্ধস্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কমলাকান্ত হয়তো ততদুর পৌঁছতে পারেন নাই। রামপ্রসাদ মাতৃ-সাধনার সুউচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়াই 'এবার কালী তোমায় খাব' বলিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। যে সাধন শক্তি আয়ত্ত হইলে সাধক লয়মুক্তি লাভ করিতে পারেন, রামপ্রসাদ তাহার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি লয়মুক্তি কামনা করেন নাই, বলিয়াছেন, 'নির্বাণে কি ফল বলনা', অথবা 'চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি'। কমলাকান্ত এই 'চিনি খেতে ভালবাসি'র স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়া ছিলেন তদুর্দ্ধে উঠেন নাই"।[১২] সেই শ্রীচক্রবর্তীই আবার প্রসঙ্গান্তরে লিখেছেন–

> *"অবশ্য সাধক কমলাকান্ত যে স্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহা দিব্যভাবেরই স্তর। দিব্যজ্ঞানীর পূজা মানস পূজা, দেহ তাঁহার সাধন-ক্ষেত্র, তাঁহার তীর্থস্নান ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার-সঙ্গম-স্নান। কমলাকান্তের পদে এই সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।"*[১৩]

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয় সাধক হিসাবে কমলাকান্ত শক্তিসাধনার শীর্ষস্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। শক্তিসাধকের চিরকাঙ্খিত যে 'মাতৃদর্শন' কমলাকান্ত সেই মাতৃদর্শন করেছিলেন। গানে তার প্রমাণ আছে। তিনি বলেছেন:

> *"এতদিনে জানিলাম, দয়াময়ী কালীগো*
> *কাতর দেখিয়ে দীনে দরশন দিলি মা"।*

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত উভয় মাতৃসাধকই স্ব-স্ব উপায়ে জগজ্জনীর আরাধনা করে গেছেন। সাধক হিসাবে উভয়ের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। তফাৎ যদি কিছু থেকে থাকে তা হল শুধুমাত্র প্রকাশের তাৎপর্য। রামপ্রসাদের গান আত্মাহারা সাধকের মগ্নচিত্তের বাণীভাষ্য আর কমলাকান্তের গান হল শিল্পীর পরিমিত বোধের শিল্পীত রসরূপ। শুধুমাত্র গান দিয়ে তাই উভয় সাধকের সত্তার পরিমাপ করা দুরূহ কর্ম।

উভয়ের কবিপ্রতিভার তুলনামূলক আলোচনাও স্ববিরোধে উচ্চকিত। যেমন শ্রদ্ধেয় ড. অরুণকুমার বসু তাঁর 'শক্তিগীতি পদাবলী' গ্রন্থে কমলাকান্তের কবিপ্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে আলোচনার শুরুতেই বললেনঃ

> *"কবি হিসাবে কমলাকান্তের প্রতিভা চমকপ্রদ নয়। প্রত্যক্ষভাবে রামপ্রসাদের পদ এবং পরোক্ষভাবে বৈষ্ণবীয় পদাবলীর উত্তরাধিকারেই তার পরিপুষ্টি।"*[১৪]

দুঃখিত, আমরা এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। কমলাকান্তের গানের মাধুর্য্য নেই, একথা বলার মতো পাণ্ডিত্য আমাদের নেই। তাই এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতজনের মন্তবেরই দ্বারস্থ হলাম। শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলেছেন:

"কমলাকান্তের পদাবলী গীতি কবিতার মত আস্বাদ্য, কেবলমাত্র আবৃত্তি করিয়াও তাহার মাধুর্য্য আস্বাদন সম্ভব। সুনির্বাচিত শব্দের ধ্বনি-ঝঙ্কার স্বভাবতঃই কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে। পদগুলি সত্যই 'Best Words in best order' এগুলি এক একটি নিটোল গীতিকবিতা। শিল্পীর সৌন্দর্য্য-বোধ, সুনির্ব্বাচিত শব্দের প্রতি অনুরাগ, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের বিচিত্র কারুকার্য্য কমলাকান্তের এই পদাবলীকে গাঢ়বন্ধ ভাবগূঢ় গীতিকবিতায় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ..."

কমলাকান্ত রাজসভার কবি। কিন্তু তৎকালীন রাজসভার আড়ম্বর-জৌলুষ, উচ্ছৃঙ্খল বিলাস-কলা তাঁহাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। ভারতচন্দ্রের তো কথায় নাই, রামপ্রসাদও যুগের হাওয়া এড়াইতে পারেন নাই, গর্হিত রুচির স্পর্শ তাঁহাদের কাব্যে আছে। কমলাকান্ত এদিক হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, অশ্লীলতার সামান্য ছোঁয়াও তাঁহাতে লাগে নাই। গ্রাম্য কবির গ্রাম্যতা-দোষ হইতেও তিনি মুক্ত ছিলেন। রস-বোধ তাঁহার ছিল, কিন্তু তাহা লইয়া তিনি 'ভাঁড়ামি' বা 'কেচ্ছা' রচনা করেন নাই। কমলাকান্তের মন 'প্রফুল্ল কমলাপ্রায়' মাতৃচরণের মধু-লোভী ভ্রমর : 'কামাদি কুসুম সকল' তাঁহার নিকট তুচ্ছ।"[১৫] ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শ্যামাসঙ্গীতের প্রসংশা করে লিখেছেন-

"কমলাকান্তের কয়েকটি শ্যামাসঙ্গীত শাক্তসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁহার কোনো কোনো পদ কবিত্বের দিক দিয়া রামপ্রসাদ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আবেগ, শিল্পরূপ, তাত্ত্বিকতা প্রভৃতি গুণগুলিকে কয়েকটি পদে চমৎকার মিশাইয়াছেন"।[১৬]

শাক্তগানের যে তত্ত্বভিত্তি রামপ্রসাদ গড়ে দিয়েছিলেন, পরম মাতৃনির্ভরতার যে ভাব তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, ধর্ম বিদ্বেষের উর্ধ্বে শক্তিময়ীর যে মহিমা তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কমলাকান্ত সেই 'প্রসাদী' ভূমিতেই তাঁর কাব্য ফসলের 'আবাদ' করেছেন। ফলিয়েছেন মণিমাণিক্য সম অতুলনীয় স্বর্ণশষ্য। অগ্রজের প্রতি কমলাকান্তের ঋণের অন্ত নেই।

উল্লেখপঞ্জি :

১) Rachel Fell McDermott, 'Mother of my heart, Daughter of my Dream's : Kali and Uma in the devotional Poetry of Bengal', 1st Ed.2001, 0xford University Press, পৃ-৩৯

২) Rachel Fell McDermott, 'Mother of my heart, Daughter of my Dream's : Kali and Uma in the devotional Poetry of Bengal', 1st Ed. 2001, 0xford University Press, পৃ-৮৬

৩) উপেন্দ্রকুমার দাস সম্পাদিত, 'কুলার্ণবতন্ত্র' (১৭/৭ শ্লোক) ১ম সং-১৯৭৬, নবভারত পাবলি., কলকাতা, পৃ.-৪৩২

৪) জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা', ৩য় সং-১৩৭০, ডি. এম.লাইব্রেরী., কলকাতা, পৃ-২৫৩

৫) স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, 'শক্তিসাধনার ধারা ও শ্রীমা সারদাদেবী' (প্রবন্ধ), উদ্বোধন, শারদীয়া সংখ্যা- ১৪১৫, পৃ-৬৪৫

৬) জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা', ৩য় সং-১৩৭০, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ-২৬০

৭) জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা; ৩য় সং-১৩৭০, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ-২৬৩

৮) অরুণকুমার বিশ্বাস, 'মাতৃসাধনা ও কমলাকান্ত', ১ম সং-২০১৩, সিগনেট, কলকাতা, পৃ-৯৬
৯) অরুণকুমার বিশ্বাস, 'মাতৃসাধনা ও কমলাকান্ত', ১ম সং-২০১৩, সিগনেট, কলকাতা, পৃ -৯৪
১০) অরুণকুমার বিশ্বাস, 'মাতৃসাধনা ও কমলাকান্ত' ১ম সং-২০১৩, সিগনেট, কলকাতা, পৃ-৯৫
১১) অরুণকুমার বিশ্বাস, 'মাতৃসাধনা ও কমলাকান্ত', ১ম স২০১৩, সিগনেট, কলকাতা, পৃ-৯৫
১২) জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা', ৩য় সং-১৩৭০, ডি. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ-২৬১
১৩) জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা', ৩য় সং-১৩৭০, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ-২৬২
১৪) অরুণকুমার বসু, 'শক্তিগীতি পদাবলী', ১ম সং-১৯৯২, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ-১৯৫
১৫) জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা', ৩য় সং-১৩৭০, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ-২৭৩
১৬) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (৩য় খন্ড, ২য় পর্ব) ২য় সং- ২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ-৩৪৯